Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনির্মানে ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিলা আক্তার জুঁই

রোলঃ 228020489

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনির্মানে ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানজিলা আক্তার জুঁই

রোলঃ 228020489

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনির্মানে ইসলাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানজিলা আক্তার জুঁই, আইডিঃ 228020489 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনির্মানে ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tanjila

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তানজিলা আক্তার জুঁই

আইডিঃ 228020489

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা....................5
একই পরিবারের অংশ....................6
ইসলামে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ....................7
সম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে অন্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি....................8
সকল সম্প্রদায়ে ইসলামের দাওয়াত....................9
নবীজি সাঃ এর জীবনী থেকে সম্প্রদায়িক সম্প্রতির শিক্ষা....................11
খিলাফতের ইতিহাসে সম্প্রতি উদাহরণ....................12
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ইসলামে ন্যায়বিচার....................14
মদীনা সনদ সম্প্রদায়িক সম্প্রতির এক মাইলফলক....................15
অমুসলিমদের নিরাপত্তায় জিজিয়া কর....................16
জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ: বিতর্ক হবে উত্তম পন্থায়....................17
উগ্রবাদীতা ইসলামের বিপরীত....................19
সহাবস্থান ও সদাচরণ: ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য শিক্ষা....................20
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্প্রদায়িক সম্প্রতি তে ইসলাম....................21
উপসংহার....................23

ভূমিকা

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থা অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও শতধা-বিভক্ত সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম বিশ্বমানবজাতি কে এমন এক সভ্যতা উপহার দেয়, যা মানুষকে মানবতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং ঔদার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে শেখায়। ইসলামের নিরন্তর প্রয়াসে মানুষ সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলাম নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উপেক্ষিত গণমানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সব ধর্মের মানুষের মাঝে স্থাপন করে এক অপূর্ব মেলবন্ধন।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে বোঝায়—একই সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। এটি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ইসলাম এই সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। ইসলাম কেবল মাত্র মুসলিমদের নয়— বরং এটি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ।

আজকের তথাকথিত আধুনিক সমাজ অনেক সময় ভুলভাবে উপস্থাপন করে, যেন ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যতটুকু সম্মান ও স্বীকৃতি অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি দেখিয়েছে, তা বিশ্বের অন্য কোনো ধর্মে বিরল।

ইসলামের শিক্ষায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই' (সুরা বাকারা: ২৫৬)।
নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মদিনা সনদ ছিল তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ, যেখানে মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পূর্ববর্তী সকল নবীগণ দের প্রেরিত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট কোন কওম এর জন্য। কিন্তু সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ বলেন:
"আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।"
(সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

একই পরিবারের অংশ

আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া এবং তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর এবং নারী (Al-Quran, 04:01)

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- মানব জাতি একে অন্যের অতি আপনজন। কারণ, এক মানুষ থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে কাছীর রহ. বলেছেন,

من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر.

অর্থাৎ আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে পৃথিবীর সকল মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে গোত্র, বৈশিষ্ট্য, বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্য সহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন অতঃপর তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন ও সম্মিলন (Ibn Kathir 1999, 1/354)।

এ থেকে বুঝা যায় মানবজাতি উৎপত্তির শুরু থেকেই সকলে পরস্পরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ মূল থেকেই তাদের বংশ পরিচয় এক এবং অভিন্ন। আমরা সকলে আদম আঃ এবং হাওয়া আঃ থেকেই এসেছি। সকলে একই পরিবারে সদস্য।

ইসলামে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ

মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ বলেছেন,
সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার পরিবারভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারভুক্তদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। (Al-Tabarānī ND, 10/105, 10033)।

কিন্তু মানুষ বিশ্ব মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা উপেক্ষা করে নিজেদেরকে বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নানা বৃত্তে আবদ্ধ করেছে। নিজ বৃত্তের ভিতরের লোকজনকে আপন এবং বৃত্তের বাইরের লোকজনকে দূরের লোক বলে গণ্য করে। যার ফলে মানুষের মাঝে বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষদের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তা তাদের মর্যাদার জন্য নয়, বরং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য।
এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,
হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের মাঝে বানিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন(Al-Quran, 49:13) ।
এখানে আরবী 'তা'আরাফু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ পরস্পরকে জানা, চেনা ও বোঝা। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা একে অপরকে জানবে ও বুঝবে এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বসবাস করবে।
সকল সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে বসবাস করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল মানুষ আশরাফুল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত। একই আদমের সন্তান, একই পরিবারের সদস্য এবং একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষদের এ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেমন সদয় ও সহানুভূতিশীল, তেমনি বিশ্বপরিবারের সকল সদস্যের প্রতিও একইভাবে সহানুভূতিশীল ও সদয় হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন।

সম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে অন্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো- কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা। বরং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি পারস্পরিক সম্মানবোধ সমুন্নত রাখা উচিত। প্রত্যেক মানুষ সে যা পালন করে সেটাকে সর্বোচ্চ সম্মান করে থাকে। কারও ধর্ম বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করা কিংবা কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা ইসলামের চেতনা পরিপন্থী কাজ।

এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ঘোষণা করেন,

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে তোমরা তাদের গালি দিও না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে (সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১০৮)।

এই আয়াতটি এক সুস্পষ্ট বার্তা দেয় অন্যের বিশ্বাস বা উপাস্যকে অসম্মান করা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। কারণ এতে পারস্পরিক বিদ্বেষ তৈরি হয় এবং সামাজিক অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম কেবল মুসলিমদের মসজিদেরই নয়, বরং সকল ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের নিরাপত্তাকেও সমান গুরুত্ব দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে:

"আল্লাহ যদি মানুষকে একে অপরের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যেত সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদি উপাসনালয় এবং মসজিদ, যেখানে অধিকহারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়।"

(সূরা আল-হজ, আয়াত ৪০)

এই আয়াত প্রমাণ করে, প্রকৃত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হলো সব ধর্মের উপাসনালয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার রাখে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়:

"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমার ধর্ম আমার জন্য।"

(সূরা আল-কাফিরূন, আয়াত ৬)

এছাড়া অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

"সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে, এখন যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।"

(সূরা আল-কাহফ, আয়াত ২৯)

এই আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়, ইসলাম কোনো ধর্ম বা মতবাদ অনুসরণে জোর-জবরদস্তি করে না। বরং বিশ্বাসের স্বাধীনতাই ইসলামের মূলনীতি।

কেউ চাইলে আল্লাহর সত্য বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, আবার তা অমান্যও করতে পারে। এর জন্য কাউকে আসামি সাব্যস্ত করা যাবে না।

মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। অমুসলিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে; মুসলিমদের নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন,

অতএব, (হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তো তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন (সূরা আল-গাশিয়া, আয়াত ২১–২২)।

কোনো ধরনের ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো নিকৃষ্ট কাজ। মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। এটি মানুষের আত্মপরিচয়কে নির্ণয় করে। আজকের দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, কিছু মানুষ ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে আক্রমণ করে। অথচ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হলো সম্প্রীতি, শান্তি ও সহনশীলতা।

সকল সম্প্রদায়ে ইসলামের দাওয়াত

আল্লাহ তা'আলা কেবল কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াত তথা সৎপথের নির্দেশনা দিয়েছেন আল কুরআনে। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন। প্রতিটি রাসূলের দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা। সকল জাতির জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।” (সূরা আন-নাহল: ৩৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে কোনো সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া হয়নি; বরং প্রতিটি জাতিকে আল্লাহর বাণী জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে,

﴿لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾

“রাসূলদের কারো মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না।” (সূরা বাকারা: ২৮৫)

অর্থাৎ সব নবী ছিলেন একই বার্তার ধারক।

এই আয়াতের মাধ্যমে কুরআন সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, সকল নবীর প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাঁদের বার্তাকে সম্মান করাই ইসলামের আদর্শ। এটি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ গঠনের ভিত্তি।

অন্ধ বিদ্বেষ না করে বোঝাপড়া জরুরি।
মানুষের বড় একটি ভুল হলো অন্য ধর্ম সম্পর্কে না জেনে বা না বুঝেই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করা। কুরআনে এমন বিদ্বেষমূলক মনোভাবের সমালোচনা করে বলা হয়েছে,

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾
"ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আবার খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ তারা উভয়েই কিতাব তেলাওয়াত করে।" (সূরা বাকারা: ১১৩)

এই আয়াত মানুষকে বোঝাতে চায় যে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পরস্পরের প্রতি কটূ মন্তব্যের চেয়ে বরং সত্য-সন্ধান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাই হওয়া উচিত নীতি।

আল্লাহ তা'আলা আহ্বান জানান একত্রে আসার যেখানে সব সম্প্রদায় একসঙ্গে মিলে সেই মৌলিক বিষয়ে একমত হতে পারে, যা সকলেরই স্বীকৃত সত্য:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾
"বলো, হে কিতাবীগণ! এসো সেই কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান।" (সূরা আলে ইমরান: ৬৪)
এই আয়াতটি আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি। কুরআনের দৃষ্টিতে, মানুষকে একসাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে সত্য খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, বিদ্বেষের মাধ্যমে নয়।
ইসলাম শুধুমাত্র নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতি চায় না বরং সব মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চায়।

নবীজি সাঃ এর জীবনী থেকে সম্প্রদায়িক সম্প্রতির শিক্ষা

নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ছিল সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা বর্ননা করা হলো:

১/ মদীনা সনদ

মদীনায় হিজরতের পর নবী মুহাম্মদ (সা.) মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ চুক্তি করেন, যাকে "মদীনা সনদ" বলা হয়। এই সনদে সব ধর্মাবলম্বীকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং পারস্পরিক সহাবস্থানের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। এতে বলা হয়, প্রত্যেকে নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে এবং সব সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা ও শান্তি রক্ষায় যৌথভাবে কাজ করবে। এটি ইসলামে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রথম লিখিত দলিল হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

তথ্যসূত্র: ইতিহাসবিদ ইবনে হিশাম তাঁর সিরাতে মদীনা সনদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

২/ খৃষ্টান প্রতিনিধিদের সম্মানজনক আতিথেয়তা

নবী (সা.)-এর নিকট একদল নাজরানী খৃষ্টান প্রতিনিধি মদীনায় আসলে, তিনি তাদের মসজিদে নববীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি তারা নিজ ধর্ম অনুযায়ী মসজিদেই উপাসনা করার অনুমতি পান। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসকে সম্মান করতে বলে। প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (সা.) শান্তিপূর্ণ আলোচনা করেন এবং তারা ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, যদিও ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তথ্যসূত্র: ইবনে ইসহাকের সিরাতে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

৩/ তায়েফবাসীদের প্রতি ক্ষমাশীলতা

নবীজি হজরত মুহাম্মদ সাঃ তায়েফ দাওয়াতি উদ্দেশ্য গমন করেন কিন্তু তায়েফবাসি নবী (সা.)-কে পাথর ছুড়ে রক্তাক্ত করে দেয়। ফেরেশতা তাঁদের শহর ধ্বংসের অনুমতি চাইলে নবী (সা.) তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

“না, আমি আশা করি তাদের পরবর্তীগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩১)

এই দৃষ্টান্ত মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতার এক অনন্য উদাহরণ। তিনি ব্যক্তিগত আঘাতকেও ক্ষমা করে একটি বড় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন।

৪/ যুদ্ধবন্দী দের প্রতি সহানুভূতি

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তাদের খাদ্য, পানি ও আশ্রয় ব্যবস্থা করে দেন। ইতিহাসে দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মুসলিম পরিবারের দায়িত্বে রাখা হয়, এবং তাদের মুক্তির জন্য শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

রাসুল (সা.) বলেন, "তোমরা বন্দীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: **১৭৩১**)

৫/ প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণ

নবী (সা.) বলেছেন:

“যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

তিনি একজন ইহুদি প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যান এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান, যা সে পরে গ্রহণ করে। এই ঘটনা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পারস্পরিক সহানুভূতি, সদ্ব্যবহার ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির চমৎকার উদাহরণ।

খিলাফতের ইতিহাসে সম্প্রতি উদাহরণ

★হযরত উমর (রা.) ও বাইতুল মুকাদ্দাস

খিলাফায়ে রাশেদিন যুগে হযরত উমর (রা.) ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম (বাইতুল মুকাদ্দাস) দখল করেন। খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ নগরীর চাবি তার হাতে তুলে দেন এই আশ্বাসে যে, তিনি জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করবেন।

প্রমাণ:

তিনি খৃষ্টানদের গির্জায় নামাজ আদায় না করে বাইরে নামাজ আদায় করেন যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানরা গির্জাটিকে মসজিদে রূপান্তর না করে।

“উমার চুক্তি” নামে পরিচিত দলিলে উল্লেখ ছিল:

“তাদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না, কেউ জোর করে তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে না।”

— [সূত্র: Al-Tabari, History of Prophets and Kings, Volume 3]

★আব্বাসীয় খেলাফত ও জ্ঞান চর্চায় সম্প্রীতি

আব্বাসীয় খিলাফতের সময় (৮ম–১৩শ শতক) “বাইতুল হিকমা” (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিত একসাথে বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণা করতেন।

প্রমাণ:
খলিফা হারুন আর রশীদ ও আল-মামুনের সময়ে গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান আরবি ভাষায় অনুবাদ হয়।

ইউক্লিড, প্লেটো, হিপোক্রেটিসের রচনাসমূহ অনুবাদ করেন খ্রিস্টান পণ্ডিত হুনাইন ইবনে ইসহাক।
— [সূত্র: George Sarton, Introduction to the History of Science]

★অটোমান খেলাফত ও ধর্মীয় সহনশীলতা

অটোমান সুলতানরা “মিললাত সিস্টেম” চালু করেন, যার অধীনে অমুসলিম সম্প্রদায় (ইহুদি, খ্রিস্টান, আর্মেনিয়ান) নিজেদের ধর্ম, আইন ও নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারত।

প্রমাণ:
এই ব্যবস্থা অটোমান সাম্রাজ্যে শত শত বছর ধরে ধর্মীয় সহাবস্থানের মডেল হিসেবে টিকে ছিল।
— [সূত্র: Bernard Lewis, The Jews of Islam]

★স্পেনে মুসলিম শাসন ও কোর্ডোবার সম্প্রীতি
আন্দালুসের মুসলিম শাসনামলে (৭১১–১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা একসাথে বাস করত এবং সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রমাণ:
কোর্ডোবা শহরকে বলা হতো “জ্ঞান ও সম্প্রীতির রাজধানী”।
ইহুদি পণ্ডিত মাইমোনিডিস মুসলিম স্পেনে বড় হয়ে ওঠেন এবং তৎকালীন মুসলিম শাসকদের সমর্থন পেতেন।
— [সূত্র: Maria Rosa Menocal, The Ornament of the World]
(উপরোক্ত সকল তথ্যসুত্র ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

খিলাফতের ইতিহাস বিভিন্ন সময় ও স্থানে ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিমদের প্রতি সম্মান, নিরাপত্তা, এবং অংশগ্রহণের সুযোগ এই ঐতিহাসিক উদাহরণগুলোতে প্রতিফলিত হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ইসলামে ন্যায়বিচার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম সর্বস্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার অন্যতম প্রধান উপায় হলো—সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তিগত পরিচয় উপেক্ষা করে ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা। ইসলামী শরিয়তে অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে কারও প্রতি পক্ষপাত বা বিরূপতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই।

আল-কুরআনের একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা অথবা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়। সে ধনী হোক কিংবা দরিদ্র আল্লাহ তাদের উভয়েরই অধিক যোগ্য। সুতরাং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ন্যায় বিচারে বিচ্যুত হয়ো না।" (সুরা নিসা, আয়াত ১৩৫)

এ আয়াতের শিক্ষা হলো সমাজে সবার জন্য সমান আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি ও সম্প্রীতি অর্জন সম্ভব।
কুরআনের আর একটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে:
“যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে একজনের জীবন রক্ষা করে, সে যেন গোটা মানবজাতির জীবন রক্ষা করল।” (সুরা আল-মায়িদা,
এই আয়াতের মাধ্যমে কুরআন মানবজীবনের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছে, তা সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ।
কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তি মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক হত্যাকারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। ইসলামী আইন অনুযায়ী, হত্যার বিচারপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সংবেদনশীল ও সুবিচারনির্ভর। হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাস (প্রতিশোধমূলক বিচার) প্রয়োগ করা যায়, তবে ইসলাম নিহতের পরিবার কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। তারা চাইলে,

1. কিসাস: হত্যার সমপরিমাণ শাস্তি – মৃত্যুদণ্ড।
2. দিয়াহ: আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ।
3. ক্ষমা: বিনা ক্ষতিপূরণে ক্ষমা করে দেওয়া।

এই তিনটি বিকল্পই কুরআনের নির্দেশিত এবং এর মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় ভারসাম্য, মানবিকতা ও সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এসব কার্যকর করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হলো রাষ্ট্র। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারে না।

অনেক আধুনিক পশ্চিমা আইনে অপরাধীর অনুশোচনা এবং সংশোধনের সুযোগ রয়েছে যা ইসলামী আইনের অনেক আগে থেকেই করা হয়ে থাকে। ইসলাম অপরাধীর প্রতি ন্যায়বিচার প্রদানে যেমন দৃঢ়, তেমনি সংশোধনের সুযোগও রেখে দেয়।

মদীনা সনদ সম্প্রদায়িক সম্প্রতির এক মাইলফলক

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বহু জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠীর সহাবস্থান সবসময়ই চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। কিন্তু ইসলাম এই সহাবস্থানকে একটি ন্যায়ভিত্তিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো মদীনা সনদ। মদীনা সনদ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় হিজরতের পর মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করেন। এটি বিশ্বের প্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান হিসেবে বিবেচিত হয়। মদীনা সনদের মাধ্যমে একাধিক ধর্ম, জাতি ও গোত্রের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়, যা আজকের "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি" ধারণার একটি বাস্তব উদাহরণ।

মদীনা সনদের মূল বৈশিষ্ট্য ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত:

★ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ সনদে বলা হয়েছে, "ইহুদিদের জন্য তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম" – যা ধর্মীয় স্বাধীনতার এক পরিষ্কার ঘোষণা। এটি আজকের ধর্মীয় সহনশীলতার মডেল।

★ পারস্পরিক সহাবস্থান ও নিরাপত্তা সব সম্প্রদায়কে একটি সম্মিলিত 'উম্মাহ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুরক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক।

★ ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সনদের আওতায় সকল পক্ষের জন্য সমানভাবে বিচারপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। কেউ কারও প্রতি জুলুম করতে পারবে না।

★ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধতা বাইরের আক্রমণ থেকে মদীনা শহর রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব বলে সনদে উল্লেখ করা হয়েছে, যা জাতিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বার্তা দেয়।

★ চুক্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ কেউ চুক্তি ভঙ্গ করলে সকল সম্প্রদায় মিলে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে—এমন বিধান ছিল, যা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
মদীনা সনদ নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল মাইলফলক। এটি দেখিয়েছে, কিভাবে বহুধর্মীয় ও বহুজাতিক সমাজেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা সম্ভব। আজকের জগতে যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, তখন মদীনা সনদের আদর্শ অনুসরণই হতে পারে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পথ।

অমুসলিমদের নিরাপত্তায় জিজিয়া কর

জিজিয়া হচ্ছে ইসলামী শাসনের অধীনে থাকা অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নেওয়া কর। এটি মূলত এক ধরনের সুরক্ষা কর। মুসলিমদের যেমন সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হতো এবং তারা 'যাকাত' প্রদান করত, অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থাকত না, তার পরিবর্তে তারা জিজিয়া কর দিত। এই কর প্রদান করেই তারা ইসলামী রাষ্ট্রে:

1. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পেতো,
2. ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা পেতো,
3. আইনগত অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করত,
4. এবং যুদ্ধ বা সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতো।

এর মাধ্যমে অমুসলিম রা শান্তিপূর্ণভাবে মুসলিমদের সাথে বসবাস করতো। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে একটি স্বীকৃত নাগরিকত্ব লাভ করত এবং মুসলিমদের পাশাপাশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপন করত। এটি সম্প্রদায়িক সম্প্রতির একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা হয়।

জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ: বিতর্ক হবে উত্তম পন্থায়

ইসলামী আইনে জোর-জবরদস্তি করা হারাম।
ইসলামী শরীয়তে জোর-জবরদস্তির কোনো স্থান নেই। কারণ, বিশ্বাস বা আকীদা মানুষের অন্তরের বিষয়। কেউ কারো অন্তরের চিন্তা-ভাবনা জোর করে বদলে দিতে পারে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:
"ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত (সত্যপথ) গোমরাহি (ভ্রান্ত পথ) থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে এমন এক সুদৃঢ় হাতল ধারণ করল, যা ভাঙ্গার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
(সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

অন্য আয়াতে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে বলা হয়েছে:
"যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি তাদের রক্ষক নন। আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া।"
(সূরা আশ-শূরা: ৪৮)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে কি না, তা একান্তই তার বিবেক ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে।

একজন দাঈ -এর কাজ হলো শান্তিপূর্ণভাবে সত্যের দাওয়াত দেওয়া। জোর করে কিছু চাপিয়ে দিলে তা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে যে সদয়, বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল, তাকে সে ভালোবাসে। আর যে জোর-জবরদস্তি করে, তাকে সে ঘৃণা করে। ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতিই হলো—ভালো আচরণ ও যুক্তিনির্ভর উপস্থাপনা।

বিতর্ক হতে হবে উত্তমভাবে
ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো যুক্তিনির্ভর বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনা। এর মাধ্যমে মানুষ অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসে এবং সত্য গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্মান ও সামাজিক সম্প্রীতিও বজায় থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
"তোমার রবের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়।"
(সূরা আন-নাহল: ১২৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন:
“যে বিতর্ক চায়, তার সাথে বিতর্ক করতে হবে ভদ্রভাবে, কোমলভাবে এবং সুন্দর ভাষায়।”

অতএব, ইসলামী দাওয়াতে বিতর্ক হলে তা হবে শালীন, মার্জিত ও যুক্তিনির্ভর; যাতে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব হয়।

সকল নবী ও আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর একটি হলো সকল নবী ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

“যারা ঈমান আনে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে সেসব কিতাবের প্রতি।”
(সূরা আল-বাকারা: ৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে:
“তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা এসেছে, এবং পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের কাছে যা এসেছে, তা বিশ্বাস করে। তারা নবীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করে না।”

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে:
“বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর, এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ও যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের ওপর; মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদের ওপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই অনুগত।”
(সূরা আলে ইমরান: ৮৪)

এই বিশ্বাস একজন মুসলিমকে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। ইসলামের এই শিক্ষা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং মানবতার ঐক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উগ্রবাদীতা ইসলামের বিপরীত

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হলো শান্তি, ন্যায়, সহনশীলতা ও মানবতার কল্যাণ। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলাই ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ সমাজে বিভেদ, ঘৃণা ও সহিংসতার জন্ম দেয়। ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাতিগত অহংকারকে নিষিদ্ধ করেছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদ: ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি
জাতীয়তাবাদ নিজে অপরাধ নয়, বরং নিজ জাতি বা দেশের প্রতি ভালোবাসা একটি স্বাভাবিক মানবিক গুণ। তবে যখন তা অতিমাত্রায় উগ্রতায় রূপ নেয়, অন্য জাতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ঘৃণা ও হিংসা ছড়ায়, তখন তা ইসলামসম্মত থাকে না। ইসলাম জাতিগত ভেদাভেদকে অস্বীকার করে এবং সব মানুষকে সমান মর্যাদার অধিকারী মনে করে।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.) বিদায় হজের ভাষণে বলেন:
" يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى".

অর্থ: “হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু একজন এবং তোমরা সবাই এক পিতার সন্তান। কোনো আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের, সাদা চামড়ার ওপর কালোর কিংবা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই, শুধুমাত্র তাকওয়া ছাড়া।”
(মুসনাদ আহমাদ: ৫/৪১১, হাদীস ২৩৫৩৬)

উগ্রতার পরিণতি:
রাসুলুল্লাহ (স.) একটি হাদীসে বলেন:
"من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية"

অর্থ: “যে ব্যক্তি অন্ধ দলীয়তাবাদের কারণে যুদ্ধ করে বা দলীয় গোষ্ঠীকে সাহায্য করে এবং এতে নিহত হয়, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।”
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮৪৮)
এ হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয়, গোষ্ঠীগত ক্রোধ ও অহংকার মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

উগ্র জাতীয়তাবাদ মানবসমাজের জন্য অভিশাপ। এটি শান্তি, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে। ইসলাম উগ্রতা, বৈষম্য ও অহংকার পরিহারের শিক্ষা দেয় এবং তাকওয়া ও ন্যায়নিষ্ঠতাকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি, জাতি ও গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের অন্ধ চেতনা থেকে বেরিয়ে এসে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির চর্চা।

সহাবস্থান ও সদাচরণ: ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য শিক্ষা

ইসলাম মানব জাতির সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে পরিচালিত একটি জীবনব্যবস্থা। অমুসলিম সম্প্রদায় যদি মুসলিমদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তাহলে ইসলামের মূলনীতি হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন (Al-Quran, 60:08) ।

কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেওয়া একেবারে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবেই বিবেচিত। তাই এ ধরণের কর্মকাণ্ডের সাথে যে সকল অমুসলিম জড়িত নেই তাদের প্রতি সদয় ও সহাবস্থানের কথা মুসলিমদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সমাজে বসবাসকারী অমুসলিদের সাথে সামাজিক কাজকর্ম যেমন উঠা-বসা, লেনদেন, খানাপিনা ও উপহার সামগ্রী আদান প্রদান ইত্যাদি সম্পাদন করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। এসকল কাজকর্ম মানুষের মাঝে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। নবী মুহাম্মদ স. বিভিন্ন সময় অমুসলিমদের কাছ থেকে উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। অমুসলিমদের তৈরি খাবার তিনি গ্রহণ করেছেন। তাদের দাওয়াত কবুল করেছেন। তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের বৈধ সকল ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, কাবীসা ইব্ন হুল্ক র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি নবী স. কে নাসারাদের তৈরি খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন:

لا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

কোনো খাদ্য সম্পর্কে তোমার মনে অযথা সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয়। এ ধরনের অমূলক সংশয়ে পতিত হলে তুমি নাসারাদের মত হয়ে গেলে (Al-Tirmidī 1417H, 371, 1565; Abū Daūd 1420H, 417, 3784)।

তবে যেসকল খাদ্য ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কেবল সে খাবার গ্রহণ করা যাবে আর যেসকল খাদ্য তাদের বিধানে বৈধ; কিন্তু ইসলামে অবৈধ তা স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মদ, শূকরের মাংস ইত্যাদি। তিনি অমুসলিমদের সাথে সর্বদা সদাচরণ করেছেন। তারা নবী স. কে বিভিন্নভাবে অমানুষিক কষ্ট ও যন্ত্রণা দিলেও নবী স. তাদের থেকে প্রতিশোধ নেননি। এমনকি তাদের অভিশাপও দেননি। বরং তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছেন। নবী মুহাম্মদ স. এর এসকল কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশনা প্রদান করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্প্রদায়িক সম্প্রতি তে ইসলাম

বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম। ইসলাম এখানে শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিচে ব্যাখ্যা করা হলো, কীভাবে ইসলাম বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে:

১. কুরআন ও হাদীসের সহনশীলতার শিক্ষা প্রসার
ইসলাম মানবিকতা, সহনশীলতা ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়।
কুরআন:

> "ধর্ম বিষয়ে জবরদস্তি নেই।" (সুরা বাকারা: ২৫৬)
"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।" (সুরা কাফিরুন: ৬)

এই আয়াতগুলো নিয়মিত খুতবা, ইসলামিক শিক্ষা ও গণমাধ্যমে প্রচার করলে মুসলমানদের মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে।

২. উলামা ও ইসলামিক চিন্তাবিদদের ইতিবাচক ভূমিকা

ইমাম ও ধর্মীয় নেতারা সমাজে মতামত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরা যদি ইসলামি সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, তাহলে সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

উদাহরণ:
জুমার খুতবায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও নৈতিকতা বিষয়ক আলোচনা।
মসজিদভিত্তিক যুব উন্নয়ন প্রোগ্রাম।

৩. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সহযোগিতা
ইসলামের মূলনীতি অনুসারে "আলোচনার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটন" (সূরা আন-নাহল: ১২৫)। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের মাঝে সংলাপের আয়োজন, যৌথ মানবিক কার্যক্রম, এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে একত্রে কাজ করা সম্প্রীতি বাড়াতে পারে।

৪. ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সহনশীলতার মডিউল সংযোজন
মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষায় ইসলামের সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও নবী (সা.)-এর জীবনের উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করলে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই সম্প্রীতির মূল্যবোধ গ্রহণ করবে।

৫. চরমপন্থার বিরুদ্ধে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরা
ইসলাম চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের ঘোর বিরোধী।
হাদীস:
"ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না, অতীতেও এরাই ধ্বংস হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম)
উপযুক্ত প্রচার ও দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ভুল ব্যাখ্যাগুলোর জবাব দেওয়া জরুরি।

৬. সামাজিক ও দাতব্য কাজের মাধ্যমে সম্প্রীতির চর্চা
ইসলাম দান ও সেবার ধর্ম। মুসলমানরা যদি রমজান, ঈদ বা অন্যান্য সময়ে অসহায় অমুসলিমদের সাহায্য করে, তা সমাজে সৌহার্দ্য গড়ে তোলে।
বাংলাদেশে ইসলাম যদি তার মৌলিক শিক্ষা—সহনশীলতা, শান্তি, ন্যায়বিচার ও দয়া—নির্ভরভাবে প্রচারিত হয়, তাহলে তা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে।

প্রয়োজন: একে কেবল ধর্মীয় নির্দেশনা হিসেবে নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও গ্রহণ করা।
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

উপসংহার

ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী কিংবা ধর্মাবলম্বীর জন্য নয়—বরং এটি একটি সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হলো মানবতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা ভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্মানজনক ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শে আমরা বারবার দেখতে পাই, তিনি শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, অমুসলিমদের প্রতিও দয়া, সহানুভূতি ও সদাচরণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

সম্প্রদায়িক বিভেদ ও ধর্মীয় উগ্রতা মানব সমাজে যে ভয়াবহ বিভ্রান্তি, সহিংসতা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করে, তার স্থায়ী সমাধান ইসলামি মূল্যবোধের মাধ্যমেই সম্ভব। কুরআনের আয়াত ও নবীজির হাদীসসমূহ মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

আজকের বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহুধর্মীয় ও বহু-জাতিগোষ্ঠীর সমাজে সম্প্রীতির বাস্তবায়ন কেবল সামাজিক দাবি নয়, বরং এক ধর্মীয় দায়িত্বও বটে। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় ধর্মের পার্থক্য মানুষের মাঝে ঘৃণা নয়, বরং সহানুভূতির সুযোগ তৈরি করে।

তাই সমাজে যখনই সাম্প্রদায়িক উগ্রতা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়াতে চায়, তখন আমাদের প্রত্যেককে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণীকে সামনে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নিজেদের আচরণ, কথাবার্তা ও জীবনচর্যায় ইসলামি সদাচরণ ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে আমরা একটি সহনশীল, ন্যায্য ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখতে পারি। এই হলো ইসলামের প্রকৃত আহ্বান সবার জন্য শান্তি, সবার জন্য ন্যায়।
ইসলামের সৌন্দর্য আমাদের জীবনব্যবস্থায় প্রতিফলিত করতে হবে, যাতে অন্য রা আরে বেশি আকৃষ্ট হয়।